রাজহংসদের সম্পর্কে বকের বকবকানি

সৃজন সেন

আমি একজন সামান্য পোস্টার লিখিয়ে সমাজ আন্দোলনের কর্মী। পোস্টারে লেখা আর ছবির মেলবন্ধন ঘটলে ছবির আকর্ষণ বাড়ে। কিন্তু আমার ছবি আঁকার কোন ট্রেনিং নেই, আর্ট কলেজে পড়ার মত সামর্থ্য আমাদের ছিলনা। স্বাভাবিকভাবে পোস্টার রচনা করতে গিয়ে ছবির জন্য অন্য শিল্পী বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে থাকি। নিজে এখান-ওখান থেকে ছবি 'ঝেপে', অন্যের ছবি নকল করে পোস্টার তৈরী করে ফেলি। এই চুরি বিদ্যায় আমার মুন্সীয়ানার কথা অনেকে এখনো জানেনা বলে শিল্পী হিসেবে আমাকে অনেকেই প্রশংসা করে। লিখিয়ে বন্ধু-বান্ধবরা তাঁদের বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দেবার জন্য আবদার করে। আমার 'ঝাপা' বিদ্যে দিয়ে এক্ষেত্রেও আমি উতরে গেছি বহুক্ষেত্রে। আর, গণবিজ্ঞান আন্দোলনের বন্ধুদের মতে আমি নাকি পোস্টার লেখার মাস্টার, কেননা, গণ বিজ্ঞান আন্দোলনে সহায়ক প্রদর্শনীর ভাঁড়ার যে আমার ঘর! সুতরাং আমাকে স্বভাব-শিল্পী বলে অনেকেই পিঠ চাপড়ান এবং তাঁদের নানা আবদার রক্ষা করতে কাগজ কালি কিনতে কিনতে আমার অভাব বেড়ে চলে। এছাড়া, আমার নিজস্ব 'চুলকানি'ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যে কোন সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনায় নিজের প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করতে আমি পোস্টার না লিখে পারিনা। পোস্টার আমার কাছে অস্ত্র। এ অস্ত্রে আমি আজীবন 'সশস্ত্র' থাকতে চাই।

সেবারও, মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইরাক আক্রমণ করার জন্য যখন লেজ আছড়াচ্ছিল, যখন পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে হাজারে হাজারে মানুষ পথে নেমেছিল, তখন কলকাতায় আমরাও এমনি একটি ঘৃণার মিছিল, বিক্ষোভের মিছিল, প্রতিবাদের মিছিল বের করার জন্য অস্থিরতা অনুভব করেছিলাম। বুশের একটা ছবি নিয়ে গিয়ে শিল্পী বন্ধু শৈবালকে ধরে ছিলাম ছবিটা একটু বড় করে এঁকে দিতে। আর বুশের ঠোঁটের ওপর এঁকে দিতে হিটলারের গোঁফ। শৈবাল আমাকে এক সন্ধ্যায় মানস কমলের বাড়ীতে আসতে বলো এ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য এবং সেখানে গিয়ে বুশের ছবি আঁকার ব্যাপারটার একটা সমাধান হোল বটে, কিন্তু ফেঁসে গেলাম অন্যত্র। একাডেমিতে মানস কমলের একটা প্রদর্শনী হবে শীঘ্রই। বেরুবে একটা স্যুভেনির জাতীয় বই। তাতে অনেক বিদগ্ধ ছবি আঁকিয়ে এবং ছবির সমালোচক পর্যালোচকদের লেখা ছাপা হবে। হঠাৎ করে কে একজন সে লেখকদের তালিকায় আমার নামটাও প্রায় জোর করে ঢুকিয়ে দিলেন। সাবোতাজটা যে কে করলো ঠিক বোঝার আগেই বুঝে গেলাম রাজহংসদের বককে জব্দ করার কাজটা সুকৌশলে ঘটে গেল।

শৈবালের কোন এক বন্ধু, পোট্রেট আঁকার হাত যাঁর সাংঘাতিক রকমের ভালো, বেশ বড় একটা বুশের মুখ এঁকে দিলেন। শৈবাল আমার হাতে বুলিয়ে দিল হিটলারের পরচুলা-গোঁফ। সেই গোঁফ লাগিয়ে কলকাতার মিছিলে বুশ ঘৃণা কুড়োলেন। এরপরই মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইরাককে 'লিবারেট' করতে তাদের ভান্ডারে যতরকম অস্ত্র আছে সেসব অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ইরাকের ওপর 'অপারেশন' শুরু করলো। আমিও আমাদের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনকে 'সশস্ত্র' করে সাজাতে পোস্টার লেখায় মেতে উঠলাম। শৈবাল জিজ্ঞেসা করে আমার লেখার কী হলো! মানস ফোন করে বলে লেখাটা কবে পাচ্ছি। ভীষণ লজ্জায় পড়লাম আমি।

কিন্তু কী লিখবো আমি? একজন বিদগ্ধ শিল্পীর প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে তো ছবি নিয়েই লেখা উচিত। ধান ভানতে লোকে শিবের গীত শুনবে কেন? মানস খুব উঁচু মানের শিল্পী। বিরাট বিরাট ক্যানভাসে ওর ছবি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি আমি। সে ছবিগুলোর অধিকাংশই 'এবষ্ট্রাক্ট' ঘরানার। আমরা, সাধারণ মানুষ বাস্তবকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত এই ঘরানার শিল্পীরা সেভাবে বাস্তবকে দেখতে চান না। যে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বাস করি, সেই সমাজের কোন চেহারা এই ঘরানার শিল্পীদের শিল্পকর্মে খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। এঁদের ছবি আত্মগতভাবে উপভোগের। বস্তুবাদ নয়, ভাববাদই এসব শিল্পীদের বড় আশ্রয়। সামাজিক জীবনে আমরা বাস্তবকে যে আঙ্গিকে দেখতে অভ্যস্ত, এই শিল্পীরা সে আঙ্গিকে জীবন ও বাস্তবকে দেখতে চান না। বাস্তব আঙ্গিককে ভেঙেচুরে তছনছ করে তাঁদের ছবিতে তাঁরা নিয়ে আসেন, অর্থহীন রঙের পোচ, রেখার সমাহার, অসংখ্য বিন্দু, ত্রিমাত্রিক প্রতিমূর্তি। স্বাভাবিক ভাবে এঁদের ছবি সর্বজনের জন্য নয়। নয় আমাদের মত মানুষের উপভোগের জন্যও। কিন্তু ঐ ছবির সামনে দাঁড়িয়ে, শিল্পীদের সামনে নিজেদের এই না বোঝাটাকে আমরা অনেকেই প্রকাশ করতে চাইনা। যদি আমাদের 'বোকা' ভাবেন তাঁরা!

কিন্তু আমাকে এই বোকামিটাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে। আমি এই ঘরানার শিল্পীদের বড় বড় ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময় অনুভব করি নিঃসন্দেহে। কিন্তু যাকে বলে ছবি উপভোগের আনন্দ তা পাই খুব কম ক্ষেত্রেই। এ এক সাংঘাতিক যন্ত্রণা!

দমদম 'সাংস্কৃতিক উৎসব, ২০০২' -এর শিল্প অঙ্গনে মানস কমলের প্রচেষ্টায় অনেক শিল্পীর কাজকর্ম চাক্ষুষ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। ঐ শিল্প অঙ্গনে যেমন পট শিল্পী, ছৌ-নাচের মুখোশ নির্মাতা শিল্পী বা ডোকরা শিল্পীরা ছিলেন, তেমনি ছিলেন আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা শিল্পীরাও। সাতদিন ধরে ঐ শিল্পীরা নিজ নিজ ঘরানায়, নিজ নিজ শিক্ষায় ছবি এঁকেছেন। বিশেষ করে, আধুনিক শিল্প-চর্চায় শিক্ষিত শিল্পীদের জন্য এখানে ছিল রঙ ও ক্যানভাসের অবাধ বন্দোবস্ত। পট শিল্পীরা চোখের সামনে বসে বসে পট আঁকছেন। ছৌ-মুখোশ শিল্পীরা মুখোশ তৈরী করছেন, ডোকরা শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মটি কী করে করতে হয় তা আগ্রহী শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দিচ্ছেন, আর আধুনিক শিল্পীরা ক্যানভাসের উপর তুলি ও রঙের সমব্যবহারে চমকের পর চমক

সৃষ্টি করে চলেছেন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে এ দৃশ্য দেখা আমার জীবনের এক বিরল অভিজ্ঞতা। পট শিল্পী ইত্যাদি গ্রামীন শিল্পীদের আঁকার উপাদান, ছবি আঁকার রীতি ও পদ্ধতি, সবকিছু একান্তভাবেই মৌলিক। অন্যদিকে, শহুরে শিল্পীদের রঙ, তুলি, ক্যানভাস সবই প্রায় মহার্ঘ ও কৃত্রিম। লোক শিল্পীরা গ্রামীণ পোশাকে মাটিতে চট বিছিয়ে বসে বসে ছবি আঁকেন। অন্যদিকে শহুরে শিল্পীরা, শহুরে পরিচ্ছদে, দামি ক্যানভাসে, দামি রঙে চেয়ার-টেবিলে ছবি আঁকেন। গ্রামীন শিল্পদেরে শিল্প বিষয় লোককাহিনী, লোক পুরাণ, মহাকাব্য। সহজ, সরল, আড়ম্বরবিহীন, জীবন্ত কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যহীনতায় একঘেয়ে। তাঁদের ছবির বিষয়বস্তু সামাজিক কিন্তু পুরাণাশ্রয়ী। আধুনিক এবষ্ট্রাক্ট ঘরানার এই শিল্পীদের কাজকর্মে সীমাহীন বৈচিত্র্য। তাঁরাও সমাজ থেকেই আসা। সমাজকে তাঁরাও দেখেন, তাঁদের ছবিতে সমাজও আসে, কিন্তু তা আসে একান্ত নিজের মত করে, সমাজ যেভাবে দেখে ঠিক সেভাবে নয়। সামাজিক মানুষ তাঁদের চিত্তলোকের দপ্‌দপানি, আমার মতে, এসব ছবিতে অনুভব করতে পারেন খুব কম ক্ষেত্রেই। সামাজিক আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পী চিত্তপ্রসাদ এক জায়গায় বলেছিলেন -- ছবি জিনিসটার মধ্যে মানুষের মন বা চিত্ত দেয়া থাকে বলেই তার নাম চিত্র। বড় ভালো লেগেছিল কথাটা। তিনি আরও বলেছেন সেই চিত্তকে গুছিয়ে দশজনের কাছে সহজবোধ্য করে প্রকাশ করার উপায় তো শিল্পীরাই গড়ে তুলতে পারেন। ছবি আঁকার অপর নাম তাই সৃষ্টি করা। চিত্তকে প্রকাশ করার ইচ্ছে থেকেই আসে ঐ সৃষ্টি করার তাগিদ। রেখা ও রঙের কারিগরি এই চিত্তকে যত বেশি প্রবলভাবে প্রকাশ করতে পারে ততই সেখানে শিল্পীর কল্পনা শক্তির বাহাদুরি।

শিল্পী ছবি আঁকেন। ছবির মধ্যে প্রকাশ পায় সমাজের মন। কোন সৃষ্টিই এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সমাজটা যেহেতু আমার ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই শ্রেণী বিভক্ত, তেমনি ছবিতে যে মনের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তা শ্রেনীবিভক্ত সমাজের মানুষ হিসেবে কোন না কোন শ্রেনীর মানুষের মনেরই আত্মপ্রকাশ। শিল্পীও শ্রেণী সমাজেরই মানুষ। তিনিও কোন না কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি। শিল্পীর উপর যে শ্রেণীর আদর্শের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, তাঁর ছবির মধ্যে সে আদর্শই সব চেয়ে বেশি ফুটে ওঠে। সেই আদর্শকেই তিনি তাঁর ছবির দর্শকদের মনে ক্রিয়াশীল করে তোলেন।

আমাদের সমাজেও , মোটা দাগে , দুটো ভাগ বিদ্যমান। স্বল্প সংখ্যক সম্পদশালী লোক আর সেই সম্পদের স্রষ্টা বিশাল সংখ্যক সম্পদহীন লোক। সম্পদের ওপর মালিকানার জোরে ঐ ক্ষুদ্রসংখ্যক সম্পদশালী লোক রাষ্ট্রের কর্তা। ঐ রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজের অধিকাংশ লোকের উপর তাদের কর্তামি। আপনি , আমি সকলের অবস্থান ঐ মোটা দাগের হয় এধারে , নয় ওধারে। আপনি জন্মগত ও কর্মগতভাবে সম্পদহীনদের দলে অন্তর্ভূক্ত হোলেও সম্পদশালীদের তৈরি করা স্কুল কলেজে পড়ে আপনি সম্পদশালীদের পক্ষের মতাদর্শে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়ে যেতে পারেন। দেশের অধিকাংশ সম্পদহীন লোককে নিজেদের পক্ষে রাখতে পুলিশ-মিলিটারির চোখ রাঙানীর চেয়ে বড় হাতিয়ার সম্পদশালীদের তৈরী করা ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের অধিকাংশই ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার দৌলতে

যা শ্রেণীগত অবস্থানের দিকে থেকে আমাদের কাম্য নয় তাঁকে কাম্য বলে গ্রহণ করতে শিখেছি । চোখ দুটি আমাদের । কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীটা ওদের দেয়া । আমাদের আলোচিত শিল্প অঙ্গনে একজন শিল্পীকে ছবিতে আলোর কারিগরি ফুটিয়ে তুলতে দেখেছিলাম দক্ষ কুশলতায় । তাঁর ছবিতে বিমূর্ত অবয়বে ছিল একজন নারী । সেই নারীর নিটোল স্তনের উপর ছিল হলুদ আলোর খেলা । নারীর স্তনের ঐ যে নিটোলতা , এটা সম্পদশালীদের ঘরের নারীর । আমাদের দেশের অপুষ্টি লাঞ্ছিতা অধিকাংশ নারীর স্তনে ঐ নিটোলতা কল্পনা করা যায়না । কিন্তু এই নারীরাই সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ । সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের বাস্তবতা আমাদের শিল্পীকে আলোড়িত করেনা । যদি করতো , তবে ঐ ছবি হোত অপুষ্টি লাঞ্ছিতা মায়ের লেপ্টে যাওয়া বুক জড়িয়ে থাকা তৃষ্ণার্ত সন্তানের ছবি । সে ছবি দর্শকদের অন্য বোধে আলোড়িত করতে পারতো । আরেক শিল্পী এঁকেছিলেন একটি বন্য বরাহের ছবি । কী অসম্ভব গতিময়তা ফুটে উঠেছিল ছবিতে ঐ ক্রুদ্ধ বন্য বরাহের । অথচ , ঐ শিল্পী যে সমাজে বাস করেন , সে সমাজে শত শত কলকারখানা আজ বন্ধ । ভবিষ্যতহীন যৌবনের চারিদিকে দেয়ালে মাথা ঠুকে মরা , কিছু না করতে পারা বেকার শ্রমিকদের পশুর মত জীবন যাপন ও ফোঁস ফোসানি ! সে যন্ত্রণা বর্তমান সমাজের শ্রমজীবী মানুষের অধিকাংশের যন্ত্রণা বলেই তা সামাজিক যন্ত্রণা । সে যন্ত্রণা যে আমাদের শিল্পী বন্ধুর ছবিতে অবয়ব পায়না , তার কারণ তার চিত্ত লোকের দুর্গটির চাবিকাঠি তিনি তুলে দিয়েছেন শ্রমচোরা সম্পদের মালিক প্রভু শ্রেণীদের হাতে । তিনি শিল্পী , কিন্তু চিত্ত হারিয়ে বসা শিল্পী । তিনি জন্তু শুওরের রাগ ও ক্ষিপ্রতা দেখেন । কিন্তু দেখেন না বেকার হয়ে পড়া তাঁর প্রতিবেশী শ্রমিকের রাগ । আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্গে ব্যাপক সমাজের বিচ্ছিন্নতার পরিণতিতেই এরকম ঘটনা আমদের চারিদিকে আমরা অহরহ দেখতে পাই ।

আবার বলছি, এই সব শিল্পীদের ছবি আঁকার মুন্সীয়ানার প্রশংসা না করে পারা যায়না । কিন্তু তাঁদের সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষেত্রেই আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে আচ্ছা আপনারা কী চান না আপনাদের দর্শকরা এ ছবি উপভোগ করার আনন্দে বিহ্বল হোক ? একবার তাঁরা বলুক, দাদা এ ছবিটা নিলে কত দাম দিতে হবে ? চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল আবেদিন, সোমনাথ হোড় ইত্যাদি শিল্পীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে এই দর্শকরা ছবিগুলোকে বোঝার আনন্দে যে ভাবে বিহ্বল হন, আপনাদের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কেন তাঁরা সে রকম বিহ্বল হন না ? কেন আপনাদের ব্যক্তিগতভাবে ভালোলাগা বিষয়বস্তুটা সামাজিক ভালোলাগার সঙ্গে একই ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যেতে পারছে না ? কেন দর্শক বন্ধুরা দূর থেকে ঐ ছবির দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যান ? কেন আপনারা তাঁদের কাছাকছি আসতে ভয় পান ? অথচ আপনারাও তো মনে মনে আপনাদের সৃষ্টি শিল্পকর্মের জন্য লোকের প্রশংসা চান ! কেন তবে দর্শকের প্রশংসার প্রত্যাশায় আপনাদের কাঙালের মত হাপিত্যেশ করতে হয় ?

আসলে এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত শিল্পীদের সঙ্গে আমার মত অশিক্ষিত পোস্টার শিল্পীরও একটা বিষয়ে দারুণ মিল । আমাদের সৃষ্ট কর্মের দর্শক হোন বলে আমরা মনের দিক দিয়ে যাঁদের কামনা করি , সেই দর্শক , অর্থাৎ আমাদের দেশের মানুষকেই আমরা জানার মত করে জানিনা , গভীরতা থেকে চিনিনা । দেশের জনগণের সমৃদ্ধশালী ভাষা , প্রাণবন্ত প্রকাশভঙ্গী কোন কিছুকেই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারিনি বলেই আমাদের এ দুর্বলতা । আমি যদি মিছিলে শ্লোগান দেবার সময় জনগণের ভাষায় জনগণের পরিচিত ঢংয়ে শ্লোগান দিতে না পারি , তবে মিছিলের লোক আমার সঙ্গে গলা মেলাবে কেন ? আমার পোস্টার লেখার হরফ যদি জনগণের কাছে অপরিচিত লাগে , তার ভাষা যদি জনগণ হৃদয়গ্রাহ্য না হয় , তবে মানুষ সে পোস্টার পড়ে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবার প্রয়োজন বোধ করবে কেন ? হ্যাঁ একথা সত্য যে , আমি যখন শ্লোগানগুলো রচনা করি , পোস্টারটা লিখি , তখন সবসময়েই আমার কাজটি আমার কাছে খুব সুন্দর মনে হয় । কিন্তু আমার ভালোলাগাটা সামাজিকভাবে ভালো লাগলো কি লাগলো না তার যাচাই একমাত্র করা সম্ভব সামাজিক মানুষ , আমার পোস্টারের সাধারণ দর্শক আমার শ্লোগানের প্রত্যুত্তরকারী সাধারণ মানুষ সেই শ্লোগান বা পোস্টার দ্বারা কতটা অনুপ্রাণিত হচ্ছে তার দ্বারা । আমার বন্ধু চিত্রকরদের ছবির মূল্যায়নেও ঠিক এভাবেই করা উচিত বলে আমি মনে করি ।

যে কোন মহৎ শিল্পই মহৎ হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট দেশের , নির্দিষ্ট কালের শিল্পের জাতীয় ধারা , লোকধারাটিকে আত্মস্থ করে । কিন্তু আমাদের দেশের জাতীয় বা লোক শিল্প তো সমাজ বহির্ভূত কোন শিল্পীর কর্ম নয় । আমাদের শিল্পীরাও এই অসম সমাজে অর্থনৈতিক ভাবে প্রবল অথচ স্বল্প সংখ্যক মানুষের কর্তৃত্বাধীন । আর ঐ অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব যাদের হাতে , তারা রাজনৈতিক কর্তৃত্বেরও অধিকারি । অধিকারি , সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বের । তাই আমাদের লোক শিল্পীদের জীবনেও ছোবল মারছে বিশ্বায়ন তথা বহুজাতিকের থাবা । তাঁদের শিল্প হয়ে উঠছে পণ্যপূজারী । শিল্প বেচে জীবিকা নির্বাহের বাস্তব অথচ নিষ্ঠুর প্রয়োজনে তাঁরাও হয়ে উঠছেন শিল্প পণ্যের বাজারের সেবক । আর , আমাদের দেশের শিল্প-অনুরাগী বুদ্ধিজীবীরা , যাঁদের আছে শিল্প নিয়ে পড়াশোনা করার সময় ও সামর্থ , তাঁদের দায়িত্ব আমাদের ঐতিহ্যশালী লোকশিল্প ও শিল্পীদের দুর্বলতার দিকগুলোকে সবলতায় পরিণত করতে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা , আন্তর্জাতিক শিল্প আদর্শের সঙ্গে দেশীয় শিল্প ঐতিহ্যের মেল বন্ধন করে দেশীয় শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য , দেশীয় শিল্পকে সমৃদ্ধ করার জন্য ব্রতী হওয়া । কিন্তু তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করেন না । তাঁরা কোলকাতা থেকে বাঁকুড়া , পুরুলিয়া , শান্তিনিকেতন ইত্যাদি স্থানে লোক শিল্পীদের কাছে প্রায়শই যান কিন্তু তা উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নয় । বলা যায় , তাঁদের ইন্টেলেকচুয়াল হাঙ্গার সেটিস্ফাই করার জন্য ।

আমার এ সমস্ত অর্বাচীনের মত বক্তব্য শুনে আমার ওপর আমার শিল্পী বন্ধুরা ক্রুদ্ধ হোতে পারেন। অভিযোগ করতে পারেন আমার দৃষ্টিভঙ্গীর যান্ত্রিকতার। আমি স্বীকার করি, শিল্পকে বিশেষ ধারায় বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে, বিশেষ কর্মে আটকে রাখা যায় না, যেতে পারেনা। মানুষের মনও যন্ত্র নয়। আমার বলার মধ্যে ভুল থেকে যেতেই পারে। যা আমি বলতে চাই তা হয়তো ঠিকভাবে বোঝাতে সমর্থ হইনি। আমার সমালোচনা হয়তো অত্যন্ত মোটা দাগের। কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু অস্বচ্ছ নয়। আমি বলতে চেয়েছি যে, ছবি একটি সামাজিক সম্পদ যদিও স্রষ্টা একান্তভাবেই ব্যক্তি। আমি বলতে চেয়েছি, সম্পদশালী ও সম্পদহীনে বিভক্ত এ সমাজে আমি কোন পক্ষের প্রতি আমার ভালোবাসা কোন পক্ষের প্রতি আমার ঘৃণা। একজন শিল্পী তাঁর ইচ্ছেমত ছবি আঁকতেই পারেন কিন্তু তাঁর ছবি সমাজের উপর, দর্শকদের উপর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তার গুরুত্ব তো কম নয়। আমি মন্তব্য করেছি আমাদের শিল্পীদের দ্বারা অনুসৃত শৈলি সম্পর্কেও। শিল্পীর আঁকা ছবির বিষয়বস্তু যদি তাঁর ছবির অধিকাংশ দর্শকদের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যায়, তবে সে ছবির কী মূল্য থাকতে পারে? বিষয় ও শৈলী তো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিষয়ের স্পষ্টতাই যে আঙ্গিককে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে যায় এ বোধে আমাদের আন্দোলিত করেছেন ক্যোথে কোলভিৎস, চিত্তপ্রসাদ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সূর্য রায়, সোমনাথ হোড়, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, জয়নুল আবেদিন। তাঁদের ছবিতে সে সময়ের বাস্তব পরিস্থিতিই শুধু বিষয় হিসেবে তাদের সহায়তা করেনি, বলিষ্ঠ শৈলনির্মিতিতেও তাঁদের সহায়তা করেছিল। বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের শিল্পীদের একই ধরনের সহায়তা করতে পারে। তবে শিল্পীরা সে সহযোগিতা নেবেন কিনা সেটা তাঁদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। আমরা সমাজের ব্যাপক মানুষ, তাঁদের ছবি দেখে কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছি, তা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য দুইই তাঁরা করতে পারেন। কিন্তু সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে বাদ দিয়ে দিয়ে তাঁদের ছবির টিকে থাকাটা দুরূহ বলেই আমার বিশ্বাস।

আমাদের বন্ধু মানস 'বেইজ ফাউন্ডেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে তাঁর কাজকর্ম করছে। শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মান উজাড় করে দিতেই বোধহয় এ প্রচেষ্টা। সময় চেতনা ছবিকে কী করে মহৎ দ্যোতনা দিতে পারে তা তো এই রামকিঙ্করদের মত শিল্পীদের কাছ থেকেই আমরা শিখেছি। তাঁর গড়া সাঁওতাল পরিবার গুচ্ছমূর্তি যে চিরন্তনতা লাভ করেছে তাতো এদেশের লেবার মাইগ্রেশন বিষয়টিকে বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করার গুণেই। তাঁর আঁকা অসংখ্য তৈলচিত্রে লিনোকাটে, এচিং-এ; ড্রইংয়ে, ভাস্কর্যে উনিশ শ বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, বাংলার মন্বন্তর সৃষ্ট তাঁর অন্তলোকের যাতনাকে যে ভাবে উপলব্ধির সুযোগ পাই আজকের শিল্পীদের শিল্পীদের অধিকাংশের সৃষ্টিতে সে যাতনা কই? দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকতে গিয়ে রামকিঙ্কর তাঁর সৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন এদেশে চিরায়ত শোষণ ও

দুর্ভিক্ষের তাৎক্ষণিক ছবিকে অবলম্বন দুর্ভিক্ষের তাৎক্ষণিক ছবিকে অবলম্বন করে আশ্চর্য বৈদগ্ধতায় তিনি এঁকেছেন এদেশের চিরায়ত ব্যবস্থার ছবি । তাঁর সাঁওতাল পরিবার মূর্তিতে তিনি রূপায়িত করেছেন এদেশের ভূমি ও সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ । তেমনি মুখহীন ধান ঝাড়াই মূর্তিতে তিনি মহীয়ান করেছেন ব্যক্তির শ্রমকে । বেইজ ফাউন্ডেশনের রূপকার মানস কমল শিল্পী রামকিংকরের আদর্শকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করলে এমন একদিন আসবে, যখন মানস কমলের ছবির জন্য এদেশের অধিকাংশ মানুষের মন হাহাকার না করে পারবে না । আমরা সে অভিজ্ঞতার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করবো ।